শরৎচন্দ্র

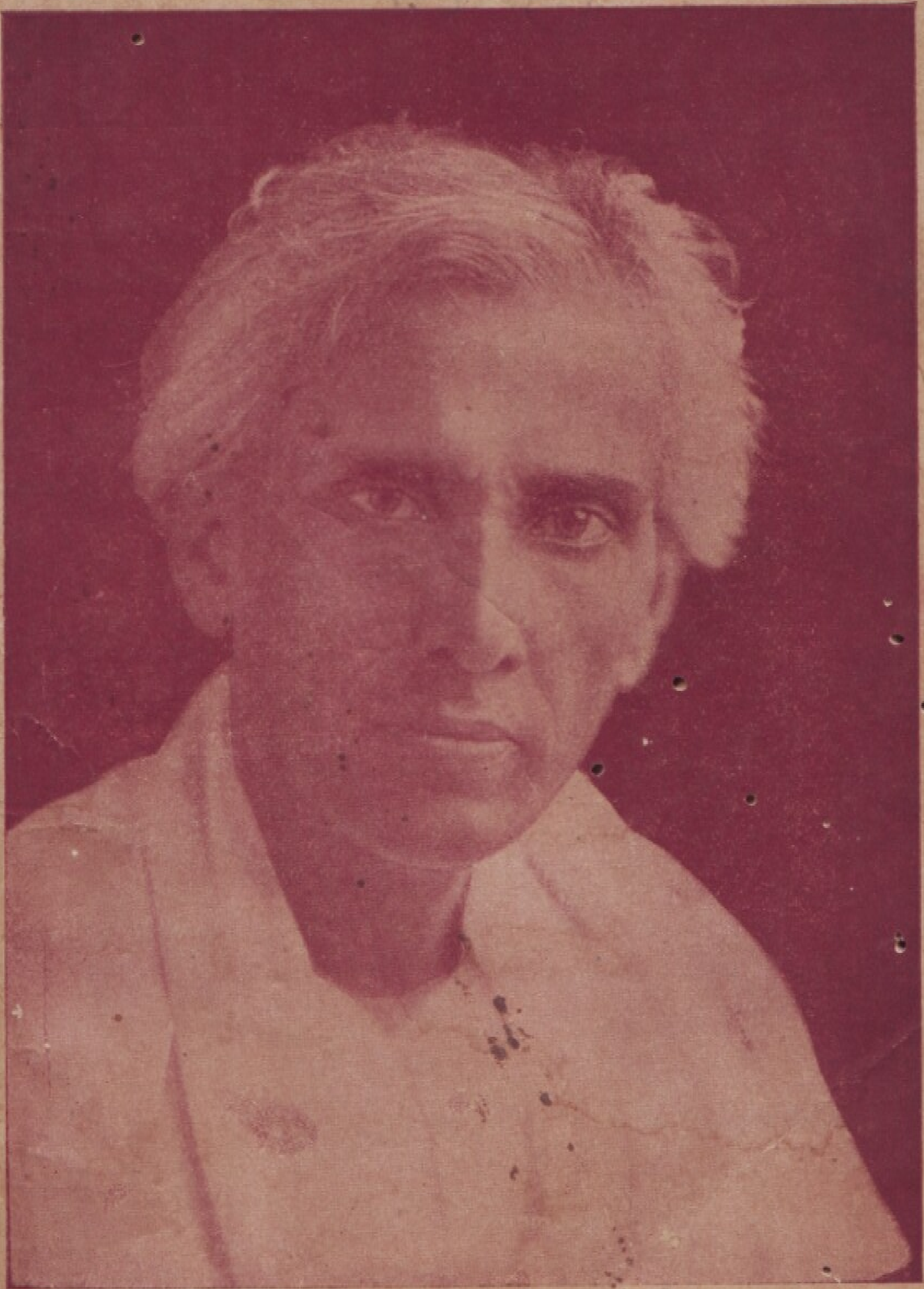

দেব সাহিত্য-কুটীর

জীবনী-সংস্করণ গ্রন্থাবলী

শরৎচন্দ্র

ক্রমিক নং ৬৮৪
পুস্তক নং শি ৩৮

দৈত্যপুরী, হিমালয়ের বুকে, বামনের দেশ ও
খুনে বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি পুস্তক-প্রণেতা

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
প্রণীত

রাজবলহাট
হুগলী

পুনর্মুদ্রণ
বৈশাখ—১৩৫২

DATE OF ENTRY
23 APR 1948

দাম চারি আনা

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীরসিকলাল পান
গোবর্দ্ধন প্রেস
২০৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জ্ঞানদা ফ্রি লাইব্রেরী
রাজবল্লহাট
হুগলী
ক্রমিক নং ৬৫৪
পুস্তক নং শি ৩৫

শরৎচন্দ্র

এক

হুগলী জেলায় দেবানন্দপুর নামে একটা ছোট গ্রাম আছে। কবিবর ভারতচন্দ্রের কৈশোর এইখানে কাটে। এই ছোট গ্রামটির আকাশ-বাতাস, গাছপালা, মাঠঘাট ভারতচন্দ্রের কিশোর-মনে বড় আনন্দ দিত। এই গ্রামেরই আবহাওয়ায় থেকে তিনি বাংলার পল্লী-প্রকৃতিকে ভালবাসতে শেখেন। শুধু বাংলার পল্লী-প্রকৃতিকে নয়, তিনি সারা পৃথিবীর সব কিছুকেই কবি-প্রাণের শ্রদ্ধা আর মমতা দিয়ে আপন ক'রে ভাবতে শিখেছিলেন। এই দেবানন্দপুরে আর একজন সাহিত্যিকের কৈশোর কেটেছিল। তিনি আমাদের শরৎচন্দ্র।

ভারতচন্দ্রের মত তাঁর মনও কবিত্বে ভরা ছিল, সব কিছুর উপর তাঁরও মমতা ছিল গভীর। এ ছাড়া তাঁর মধ্যে আমরা আরো অনেক কিছুর সন্ধান পেয়েছি। তিনি যে-সব বই, যে-সব প্রবন্ধ লিখে গেছেন, তা প'ড়ে বেশ বোঝা যায়, মানুষের জীবনের নানান দিক্‌কার দুঃখকষ্টে তাঁর মন বেদনায় ভ'রে উঠ্‌ত, সমাজের যা কিছু অন্যায় তার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী মন সজাগ ছিল, মানুষের সবল ও দুর্ব্বল মনের সকল দাবীকে তিনি মানুষের মন নিয়েই বিচার ক'রে দেখতেন।

বাংলা ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র, ইংরাজী ১৮৭৬ সালে দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী।

মতিবাবুর সাতটি পুত্রকন্যা। প্রথম—জ্যেষ্ঠা কন্যা অনিলা দেবী, দ্বিতীয়—জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্র, তারপর দুটি পুত্রের শৈশবেই মৃত্যু হয়, পঞ্চম—পুত্র প্রভাসচন্দ্র, ষষ্ঠ—পুত্র প্রকাশচন্দ্র, সপ্তম—কনিষ্ঠা কন্যা সুশীলা দেবী।

প্রথম ছয়জনের দেবানন্দপুরেই জন্ম হয়, কনিষ্ঠা কন্যার জন্ম হয় ভাগলপুরে। এই ভাগলপুরে মতিবাবু কার্য্যোপলক্ষে বাস করতেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামীর নাম ৺পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, কনিষ্ঠার স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও ভগিনীপতির অনুরোধে শরৎচন্দ্র পানিত্রাসে সামতাবেড় গ্রামে বাড়ী নির্ম্মাণ করেছিলেন।

ভুবনমোহিনী দেবীর পিতার নাম ৺কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ও তাঁর ভাই ভাগলপুরে বাস করতেন। কেদারবাবুর দুই পুত্র ৺ঠাকুরদাস ও শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস।

শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে পিয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালায় প্রথম ভর্ত্তি হন। এই পাঠশালাটি পরে উঠে গিয়ে ভার্নাকুলার স্কুল হয়। শরৎচন্দ্র এই ভার্নাকুলার স্কুলেও এক বৎসর পড়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের পিতা বড় স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তিনি নিজের ছেলেমেয়েদের কখনও কঠোরভাবে শাসন করতেন না। তিনি তাদের নিয়ে খেলা করতেন, তাদের গল্প বলতেন, আর নানা কথার মধ্য দিয়ে নীতিশিক্ষা দিতেন। তাঁর হাতের লেখা বড় সুন্দর ছিল। শরৎচন্দ্রের হাতের লেখাও তাঁর পিতার হাতের লেখার মতই ছিল।

দেবানন্দপুরে কিছুকাল কাটবার পর মতিবাবু সপরিবারে ভাগলপুরে চ'লে যান। সেখানে তিনি শরৎচন্দ্রের মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মতিবাবুর সংসারে বা কোন বাঁধাধরা কাজে তেমন মন ছিল

পাতা মুড়িবেন না
দাগ কাটিবেন না
মন্তব্য লিখিবেন না

না। তিনি ইংরাজী ও বাংলা লেখাপড়া বেশ ভালই জান্‌তেন। সেজন্যে তাঁর চাকরী জুটতে দেরী হ'ত না। কিন্তু তিনি নিয়মিতভাবে চাকরী করতে পারতেন না।

মনে প্রাণে তিনি ছিলেন একজন শিল্পী। সৌন্দর্য্যের উপাসক শিল্পীর পক্ষে বাঁধাধরা চাকুরী করা খুবই কঠিন। তিনি ছবি আঁক্‌তে পারতেন। গল্প ও উপন্যাস রচনায়ও তাঁর বেশ হাত ছিল। শরৎচন্দ্র পিতার এই সব হাতেলেখা গল্প ও উপন্যাস লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন, আর সেগুলো প'ড়ে যথেষ্ট আনন্দ পেতেন। কিন্তু এই সব রচনার কোনটাই তাঁর পিতা শেষ করেন নি। শরৎচন্দ্র কল্পনায় নিজের মনে পিতার অসমাপ্ত রচনাগুলির এক-একটা সমাপ্তি টেনে নিতেন। পরে এই থেকেই তিনি গল্প ও উপন্যাস রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রও ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। তাঁর মহাশ্বেতা নামে একখানা অতি চমৎকার ছবি ছিল। এই ছবিখানা যিনিই দেখেছেন তিনিই সুখ্যাতি করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন সুন্দর ছবিটি এখন আর নেই। রেঙ্গুনে থাক্‌বার সময় আগুন লেগে যখন বাড়ী পুড়ে যায়, সেই সময় এই ছবিটিও নষ্ট হ'য়ে গেছে। এ ছাড়া আরও অনেক ভাল ভাল ছবি তিনি এঁকেছিলেন। এই ছবি আঁকার প্রেরণাও তিনি পিতার কাছ থেকেই লাভ করেন।

শরৎচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী দেবী বড় সহজ ও সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর মন স্নেহে ভরা ছিল। তিনি সেবাযত্নে সকলকেই তৃপ্ত করতেন। মানুষের তো দূরের কথা, তিনি পশুপক্ষীদেরও কষ্ট সইতে পারতেন না। শরৎচন্দ্র মায়ের কাছ থেকে পরদুঃখে কষ্ট অনুভব করার মত কোমল মন পেয়েছিলেন।

একবার শরৎচন্দ্র রূপনারায়ণ নদের পাড়ের উপরের সরু রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। গ্রীষ্মের বৈকাল। আকাশ কালো মেঘে অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। প্রচণ্ডবেগে ঝড় বইতে আরম্ভ করেছে। ফের্‌বার পথে তিনি দেখ্‌লেন এক তেঁতুল গাছের তলায় একটা ইঁদুর ধুকছে। ইঁদুরটার অবস্থা দেখে তাঁর মনে বড় কষ্ট হ'ল। তিনি ঝড়ের কথা ভুলে গিয়ে সেই ইঁদুরটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন। কিন্তু তিনি ইঁদুরকে বাঁচাতে পারেন নি।

এই কাহিনী তাঁকে অনেক দিন পর্য্যন্ত বল্‌তে শোনা গেছে। সেদিনকার ঝড়জলে তাঁকে বড়ই বিব্রত হ'তে হ'য়েছিল; কিন্তু সে কথা তিনি কোনদিন একবারও বলেন নি। তাঁর জীবনের এইরকম অনেক ঘটনা থেকে জানা যায়, তাঁর মন ছিল বড় কোমল।

শরৎচন্দ্র শৈশবে বড় দুরন্ত ছিলেন। পাঠশালার ছেলেরা তাঁর দুরন্তপনায় প্রায়ই ত্যক্ত-বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ত। শরৎচন্দ্রের এই ব্যবহারে বাড়ীর আর সবাই তাঁকে বকতেন, বল্‌তেন, 'এ ছেলে কোনকালেই মানুষ হবে না।' শুধু তাঁর ঠাকুরমা বল্‌তেন, 'এ ছেলের মতিগতি এমন থাক্‌বে না। দেখিস্‌, একদিন এ অনেক বড় হ'য়ে উঠ্‌বে।' তাঁর কথা সফল হ'য়েছিল।

দুই

শরৎচন্দ্র ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে বড় ভালবাসতেন। প্রবীণ বয়স পর্য্যন্তও তাঁর এই বাতিক যায়নি। তিনি দেবানন্দপুরে থাক্‌তে মাছ ধরা নিয়ে অনেক সময় কাটিয়ে

দিতেন। প্রায় সময়েই তিনি পুকুরে ডোবায় মাছ না ধ'রে নদীতে মাছ ধরতে যেতেন। এই মাছ ধরার বাতিকের জন্যে দেবানন্দপুরে থাকতে লেখাপড়ার দিকে তাঁর তেমন মন ছিল না। ভাল ক'রে পড়াশুনো না করলেও তিনি বেশ প্রতিভা-বান ছিলেন ব'লে স্কুলের অপর ছেলেরা তাঁর সঙ্গে পেরে উঠ্‌ত না।

ভাগলপুরে এসে তিনি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এখানে এসে পড়াশুনোয় একটু মনোযোগ দেখা গেল; ফলে তিনি ক্লাসের 'ভাল ছেলে' ব'লে সুনাম লাভ করলেন।

ছেলেবেলায় তাঁর ফড়িং ধরা ও ফড়িং পোষার একটা মস্ত সখ ছিল। তিনি একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে নানারকমের ফড়িং সংগ্রহ ক'রে রাখতেন। এই ফড়িং সংগ্রহ করার জন্যে তিনি নিজের গ্রামে মাঠেঘাটে বনেজঙ্গলে ঘুরে তো বেড়াতেন-ই, কখনও কখনও পাশের অন্যান্য গ্রামেও চ'লে যেতেন।

বাগান করার সখও তাঁর খুব প্রবল ছিল। তিনি নিজের হাতে বেড়া দিয়ে ফুলের বাগান তৈরী ক'রেছিলেন; বাগানে কৃত্রিম জলাশয় তৈরী ক'রে গাছের গোড়ায় নিজে জল ঢেলে, নিজের হাতে ভাল ক'রে বাগান সাজিয়ে তিনি বড় আনন্দ পেতেন।

বালক শরৎচন্দ্র পুরুষোচিত নানারকম খেলায় সুদক্ষ ছিলেন। ঘুড়ি ওড়ানো, লাট্টু ঘোরানো, গুলিখেলা প্রভৃতিতে তিনি বেশ নিপুণ ছিলেন। পাড়ার ফলের বাগানে তাঁর যথেষ্ট যাতায়াত ছিল। আর এ বিষয়ে তাঁর অপূর্ব্ব পটুতা দেখে তাঁর সঙ্গের ছেলেরা অবাক হ'য়ে যেত। পরের বাগানে ফল চুরি করা, মাঠে মাঠে ঘুড়ি উড়িয়ে বেড়ানো—এই রকম সব স্মরণীয়

কাজগুলি শরৎচন্দ্রকে বাড়ীর অভিভাবকদের লুকিয়ে করতে হ'ত। সময় সময় অভিভাবকেরা জানতে পারলেও শরৎচন্দ্রের বুদ্ধির সঙ্গে তাঁরা এঁটে উঠতে পারতেন না।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্কুলের শিক্ষকদের বেশ প্রিয় হ'য়ে ওঠেন।

তিনি স্কুলের ছেলেদেরও খুব প্রিয় হ'য়ে উঠেছিলেন। ছেলের দল তাঁর একান্ত অনুগত হ'য়ে পড়েছিল। খেলার মাঠে শরৎচন্দ্র ছিলেন তাদের পাণ্ডা। ছেলেরা তাঁর সঙ্গ পেলে বড় খুসী হ'ত।

ব্যায়ামের দিকে শরৎচন্দ্রের বেশ নজর ছিল। তিনি গঙ্গার ধারে একটা পড়ো-বাড়ীর উঠোনে একটা আখড়া খেলেনি। এই বাড়ীটার নাম ছিল, 'ভূতের বাড়ী'। একবার তিনি ছেলের দলকে নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে পাড়ার এক বাঁশ-ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে আনেন এবং সেই 'ভূতের বাড়ী'তে ব'সে সেই রাত্রেই এক জোড়া প্যারালাল বার তৈরি করার বন্দোবস্ত আংশিকভাবে সেরে ফেলেন।

কিন্তু এমন দুর্দ্দান্ত ছেলেরও একটা তপোবন ছিল। সেই তপোবনে তিনি কাউকে বড় একটা নিয়ে যেতেন না। গঙ্গার পাড়ের উপরে কতকগুলো নিম আর কামরাঙা গাছ ছিল। নানা লতা আর গাছপালায় সেই জায়গাটা বন হ'য়ে ছিল। তার মধ্যে একটা জায়গা একটু পরিষ্কার ক'রে শরৎচন্দ্র ঈশ্বরের ধ্যানে বসতেন। নীচে গঙ্গার জল কল্‌কল শব্দে ব'য়ে চলেছে। কোথাও আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। এই নির্জ্জন স্থানে ব'সে পবিত্র মনে কিশোর শরৎচন্দ্র ভগবান্‌কে ডাকতেন।

ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হ'য়ে শরৎচন্দ্র প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হন, আর ডবল প্রোমোশন পান, এই থেকে তাঁর পড়ার উৎসাহ আগেকার চেয়ে আরো অনেক বেড়ে যায়। তিনি শুধু স্কুলের বই-ই যত্ন নিয়ে পড়তেন না, বড় বড় লোকের লেখা নানা বই, মাসিকপত্র, খবরের কাগজ—সবই তিনি পরম আগ্রহে মন দিয়ে পড়তেন।

শরৎচন্দ্র নদীতে নাইতে বড় ভালবাসতেন। দেবানন্দ-পুরে থাকতে তিনি নদীতে নাইতেন, ভাগলপুরে এসেও তিনি গঙ্গায় নাইতেন। গঙ্গায় অনেকক্ষণ ধ'রে সাঁতার কাটা তাঁর অভ্যাস ছিল। বেশী গরম পড়লে তিনি বিকেলেও গঙ্গায় নাইতে যেতেন। গঙ্গার জলে গা ডুবিয়ে তিনি বালির উপর ব'সে থাকতেন। সেই সময়ে আকাশের মেঘের রঙ্, দূরের মাঠ থেকে উড়ে যাওয়া পাখীর ঝাঁক, খড়ের নৌকোর দাঁড়ের শব্দ—তাঁর বড় ভাল লাগ্‌ত। কখনও কখনও ঝড় এসে গঙ্গার জলকে উতলা ক'রে তুল্‌ত। তিনি চুপ ক'রে সেই ঝড়ের দৃশ্য প্রাণের সকল আনন্দ দিয়ে উপভোগ করতেন। হয় তো সেই সময়ে অন্যান্য ছেলেরা ঘরে দরজা দিয়ে ব'সে আছে।

গাছে ওঠা, গাছের উপর ঘুমোনো তাঁর খুবই সহজ হ'য়ে গিয়েছিল। রাজেন্দ্র ব'লে তাঁর একটি বাল্য সঙ্গী তাঁকে এই সব দুঃসাহসী কাজে অভ্যস্ত ক'রে তুলেছিল। এর কাছেই শরৎচন্দ্র শিখেছিলেন, পৃথিবীতে ভয় ব'লে কিছু নেই। এরই প্রেরণায় অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জন মাঠে-ঘাটে বনে-জঙ্গলে চলতে তাঁর ভয় করত না। এমনি ক'রেই শরৎচন্দ্র তাঁর কিশোর-মন নিয়ে বুঝতে পারেন, অন্ধকারেরও রূপ আছে, অন্ধকার মানুষের সকল শ্রান্তি দূর করে, অন্ধকার মানুষের মনকে শান্তিতে ভরিয়ে তোলে। এই রাজেন্দ্রের কাছেই শরৎচন্দ্র বাঁশী বাজানো শিখেছিলেন।

গান-বাজনার উপর শরৎচন্দ্রের খুব ঝোঁক ছিল। তিনি বাঁশী ভাল বাজাতে পারতেন না ; কিন্তু তবলা, বেহালা, এস্রাজ ও হারমোনিয়ম বাজনায় সুদক্ষ হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁর গলার স্বর খুব মধুর ছিল। তাঁর কীর্ত্তন আর মহাজন-পদাবলী গান শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যেতো।

তিনি ভাল অভিনয় করতে পারতেন। দেবানন্দপুরে থাক্‌তে তিনি পাড়ার এক অবৈতনিক নাট্যসমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সমিতির উদ্যোগে যে অভিনয় হয়, তা'তে তিনি বেশ সুখ্যাতি পেয়েছিলেন। স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকা অভিনয়ে তিনি সুদক্ষ ছিলেন।

নানা দেশে ভ্রমণ করবার তাঁর একটা প্রবল ঝোঁক ছিল। তিনি প্রায়ই বাড়ীর কাউকে না ব'লে পালিয়ে যেতেন তারপর কিছু দিন নানা স্থানে ঘুরে-ফিরে আবার বাড়ীতে ফিরে আস্‌তেন। সুযোগ পেলে আবার পালিয়ে যেতেন। একবার তিনি পালিয়ে পায়ে হেঁটে পুরী পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন।

তিন

'সাংসারিক গণ্ডগোলে মতিবাবু কিছুদিনের জন্যে ভাগলপুর ছেড়ে দেবানন্দপুরে চ'লে আসেন। দেবানন্দপুরে এসে শরৎ-চন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হন।

এখানে শরৎচন্দ্রের মাছ ধরা, আর পরের বাগানের ফলফুল চুরি করার নেশা অনেকটা বেড়ে ওঠে।

দীঘির পাড়ে আম-বাগানের ধারে উঁচু গড়ের আড়ালে একটা গভীর গর্ত্ত ছিল। সেইখানেই তাঁর চোরাই জিনিষ রাখ্‌বার, আর প্রয়োজন হ'লে লুকিয়ে থাক্‌বার জায়গা ছিল।

কিছুদিন বাদে মতিবাবু আবার ভাগলপুরে চ'লে যান। শরৎচন্দ্রও তাঁর সঙ্গে এলেন। এখানে এসে শরৎচন্দ্র তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই স্কুল থেকে তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে তিনি 'বাসা' ব'লে একটা উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন। এইটেই তাঁর প্রথম উপন্যাস।

এই লেখাটা শরৎচন্দ্র শেষে নিজেই ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। কেননা, লেখাটা তাঁর পছন্দ হয় নি। এমনি অনেক গল্প-উপন্যাসই তিনি লিখে নষ্ট ক'রে ফেলেছিলেন। তিনি ছেলে-বয়স থেকেই গল্প-উপন্যাস লিখ্‌তে আরম্ভ করেন, কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছরের আগে তাঁর কোন লেখাই প্রকাশিত হয় নি।

প্রবেশিকা পাশের পর তিনি তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে এফ-এ পড়্‌তে আরম্ভ করেন। এই সময় থেকে তিনি ইংরাজী উপন্যাস ও বিজ্ঞানের বই বেশী ক'রে পড়্‌তে থাকেন। এই সব বই পড়তে পড়তে তিনি কোন্ বই-এর অনুবাদ করেন, কোন বই-এর ছায়া অবলম্বনে বই লেখেন। সেই সব বই ছাপা হয় নি, সেগুলো আর খুঁজেও পাওয়া যায় না।

কলেজে পড়ার সময় রাজেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। রাজেন্দ্রের সঙ্গে তিনি প্রায়ই জেলে-ডিঙি ক'রে গঙ্গায় ভেসে চ'লে যেতেন। কোন কোন দিন তাঁদের ফিরতে অনেক রাত হ'য়ে যেতো।

শরৎচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ বহুবার এর প্রমাণ পেয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র ইংরাজী ভাল জানতেন। কিন্তু তাঁর মাতৃভাষার উপর প্রবল অনুরাগ ছিল। তাই তখনকার দিনে ইংরাজীতে চিঠি লেখার প্রথার যথেষ্ট মর্য্যাদা থাকলেও, তিনি সাধারণতঃ

বাংলাতেই চিঠিপত্র লিখ্‌তেন। কখনও কাউকে ইংরাজীতে লিখ্‌তেন না।

তাঁর সম্পর্কীয় মাতুল ৺গিরীন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চেষ্টায় "শিশু" নামে একখানা হাতেলেখা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র এই পত্রিকার প্রধান লেখক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই পত্রিকার মাত্র কয়েক সংখ্যা প্রকাশ হ'য়েছিল।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখার পরম ভক্ত ছিলেন। কলেজে পড়ার সময় নানা কাজের ফাঁকে তিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তেন। এই সময় থেকেই তাঁর রবীন্দ্রনাথের মত একজন উঁচুদরের লেখক হবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। শরৎচন্দ্র নিজের ভাষায় লিখেছেন—

"ছেলেবেলার কথা মনে আছে। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে, তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই, ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হ'লে আবার একদিন ক্ষত-বিক্ষত পায়ে নির্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর-অভ্যর্থনার পালা শেষ হ'লে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান ক'রে দেন, সেখানে আর এক দফা সম্বর্দ্ধনা লাভের পর আবার বোধোদয়, পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে। আবার সাগরেদি সুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি আদর-আপ্যায়ন সম্বর্দ্ধনার ঘটা। এমনি ক'রে বোধোদয় পদ্যপাঠের সঙ্গে বাল্য জীবনের এক অধ্যায় সাঙ্গ হ'ল।

এলাম শহরে। একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি ক'রে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাব সদ্‌গুরু ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু প'ড়ে যাওয়া নয়, মাসিক বা সাপ্তাহিক সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তার পরে বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যিকের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য-উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য। সেখানে সবাই চায় পাশ করতে এবং উকিল হতে। এরই মাঝখানে আমার দিন কেটে চল্‌ল। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, কাব্যে আসক্তি। বাড়ীর মেয়েদের জড় ক'রে তিনি একদিন প'ড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়েছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চ'লে এলাম। কিন্তু, রবীন্দ্র-কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয় বার পরিচয় ঘটলো, এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়।

এর পরে এ বাড়ীর উকিল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইল না; আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরানো পল্লীভবনে। কিন্তু এবার আর বোধোদয় নয়—বাবার ভাঙা

দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম 'হরিদাসের গুপ্তকথা'। আর বেরোলো 'ভবানী পাঠক'। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ্‌ছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই ক'রে নিতে হলো আমাকে বাড়ীর গোয়াল ঘরে। সেখানে আমি পড়ি, সঙ্গীরা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে, জানিনে!

একই স্কুলে বেশীদিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টার মশাই স্নেহবশে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হোল শহরে। বলা ভাল, এর পর আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয় নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যে এর পরেও যে আর কিছু আছে তা' তখন ভাবতেও পারতাম না। প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা যে করিনি তা নয়। লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তারপর এলো 'বঙ্গদর্শনের' নবপর্য্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ অনুভূতির স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলবো না। কোন কিছু যে এমন ক'রে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্ব্বে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিন পরে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে অনেক পাওয়া যায়, একথা সত্য নয়। ওইতো খানকয়েক পাতা তার মধ্য

দিয়ে, যিনি এত বড় সম্পদ্ আমার হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায় ?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি, ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনদিন লিখেছি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—কবিকে কেন্দ্র ক'রে কি ক'রে যে নবীন বাংলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভ'রে উঠলো, আমি তার কোন খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনোদিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন! এটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল, কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও কথা-সাহিত্য এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বারম্বার ক'রে পড়েছি; কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে 'আর্ট', কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনো ত্রুটী ঘটেছে কি না—এ সব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ও সব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকুই ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হ'তেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার এই ছিল পুঁজি।

* * *

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্যসেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক'রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হ'য়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের

কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম, ভয়ের কথা মনেই হোলো না।

আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হ'তে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি।

পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘর-ছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভ'রে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম।

আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ' আমার কাছে নেই—কবে কেমন ক'রে হারিয়ে গেছে, সে কথাও আমার মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কত বার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ ক'রে যান নি—এই ব'লে কত দুঃখই না করেছি! অসমাপ্ত অংশগুলি কি হ'তে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধহয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে সুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প রচনা, অকেজোর কাজ মনে ক'রে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চ'লে গেল। আমি যে কোন-কালে একটি লাইনও লিখেছি, সে কথাও ভুলে গেলাম।

আঠার বৎসর পরে হঠাৎ একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব-দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটি কয়েক পুরাতন

বন্ধু একটি ছোট মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকদের কেউই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার নিকট থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন।

এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার করেছিলাম। উদ্দেশ্য, কোন রকমে একবার রেঙ্গুনে পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্যসত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে-না-হতেই বাংলার পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তারপর থেকে আমি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে লিখে আসছি।"

চার

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের মাতার মৃত্যু হয়। তখন তিনি পিতার সঙ্গে ভাগলপুরের মাতুলালয় ছেড়ে খঞ্জরপুর নামে এক পল্লীর এক বাসাবাড়ীতে গিয়ে থাকেন। এখানে তিনি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন।

এফ-এ পরীক্ষার ফী না জোটায় শরৎচন্দ্র পরীক্ষা দিতে পারেন নি। এর পর থেকে তিনি সাহিত্য-সেবায় বিশেষ ভাবে মন দেন। কবিতা তাঁর বড় ভাল লাগ্ত। তিনি কয়েকটা

কবিতা লিখেও ছিলেন। কিন্তু পদ্য-রচনায় তাঁর বিশেষ সুবিধে হ'ত না। তাই তিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

বাংলা ১৩১৯ সালে 'যমুনা' ও 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্র দু'খানিতে শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলাকার রচনা প্রকাশিত হয়।

তাঁর 'অভিমান', 'পাষাণ', 'ব্রহ্মদৈত্য' প্রভৃতি কয়েকটি রচনা ছাপা হয় নি ; এখন কোথাও তার খোঁজও মেলে না।

তাঁর 'বাগান' বইখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত ছিল। প্রথম খণ্ডে 'বোঝা,' 'কাশীনাথ' ও 'অনুপমার প্রেম,' দ্বিতীয় খণ্ডে 'কোরেল গ্রাম' (ছবি), 'বড়দিদি' ও 'চন্দ্রনাথ', তৃতীয় খণ্ডে ছিল 'হরিচরণ', 'দেবদাস' ও 'বাল্যস্মৃতি'। এই সব রচনা তাঁর পনের-ষোল বছর বয়স থেকে চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে লেখা।

ভাগলপুরে রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটা থিয়েটারের দল গ'ড়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র এই দলে যোগদান করেন। গিরিশচন্দ্রের 'জনা' বই-এর জনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শরৎচন্দ্র যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র রাত জেগে রোগীর সেবা করতেন, শ্মশানে শব নিয়ে যেতেন। পাড়ার বারোয়ারী বা অন্য কোন উৎসবে তাঁর সাহায্য না হলে কাজ সুসম্পূর্ণই হত না। এই সব কারণে তিনি সাধারণের বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

মাতার মৃত্যুর পর পিতা যখন খঞ্জরপুরে চলে যান তখন সংসারে দারুণ অন্নকষ্ট দেখা দেয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র রাজা বানেলী এষ্টেটে চাকরী পান। এই চাকরী করতে থাকার সময়ে তিনি বন্দুক ছোঁড়ায় সুদক্ষ হয়ে ওঠেন।

একবার শরৎচন্দ্র পিতার কয়েকটি রঙিন ও উজ্জ্বল পাথর তাঁর এক ধনী বন্ধুকে উপহার দেন। এতে পিতা তাঁকে ভৎ´সনা

করেন। স্নেহময় পিতার কাছ থেকে এই তাঁর প্রথম ভৎ'সনা পাওয়া। যিনি কোনদিন কোন তিরস্কার করেন নাই, এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তিনি যদি কখনো কোন তিরস্কার করে বসেন, তাহলে সে যেন মর্ম্মের অন্তস্তলে যেয়ে আঘাত করে! শরৎচন্দ্রের মনে আঘাত লাগল। তিনি অভিমান-বশে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন, আর সন্ন্যাসী হয়ে নানা দেশে ঘুরে বেড়ান।

পরে তিনি মজঃফরপুরে ফিরে আসেন, আর কিছুদিন ধর্ম্মশালায় থাকবার পর মাস দুই অনুরূপা দেবীর বাটীতে থাকেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সাইকেলে মজঃফরপুর থেকে ভাগলপুরে চ'লে যান। সেই সাইকেল বেচেই তাঁকে পিতার শ্রাদ্ধাদি কাজ করতে হয়েছিল।

পিতার মৃত্যুতে ভাইবোনদের ভার তাঁর উপরে পড়ে। তিনি ৺প্রভাতচন্দ্রকে (স্বামী বেদানন্দ) আসানসোলে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে, সুশীলা দেবীকে খঞ্জরপুরের বাড়ীওয়ালার পত্নীর কাছে, আর প্রকাশচন্দ্রকে জলপাইগুড়িতে এক আত্মীয়ের কাছে রেখে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় সুবিধামত কোন চাকরী মেলে না। শেষে তিনি রেঙ্গুনে তাঁর মেসোমশাই অঘোর বাবুর কাছে চ'লে যান। এই অঘোর বাবু ছিলেন অত্যন্ত দিলদরিয়া প্রকৃতির লোক। ইনি মুক্তহস্ত ছিলেন, সকলদিক দিয়ে এঁর মন ছিল উদার। এঁর কাছে এসে শরৎচন্দ্রের মন শান্তিতে ভ'রে যায়।

এই মেসোমশাই বেঁচে থাকলে তাঁর যথেষ্ট উপকার করতে পারতেন। কিন্তু কিছু সাহায্য করার আগেই তিনি মারা যান। ফলে শরৎচন্দ্র বিদেশে আবার নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন।

ইতিমধ্যে বর্ম্মী ভাষায় তাঁর বেশ দখল হ'য়েছিল। তিনি কিছুদিন বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে তার পর কিছুদিন বাউলের বেশে পেগু, টোংগু প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন।

যাহোক্, পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত এস, কে, মিত্রের চেষ্টায় একাউন্ট্যান্ট জেনারেল আফিসে তিনি একটা চাকরী পান।

গান গাওয়া ও বাজানা বাজানোর জন্য তিনি দিন দিন সেখানকার বাঙ্গালীদের বেশ পরিচিত হয়ে পড়লেন। বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাব নামে রেঙ্গুনের প্রবাসী বাঙ্গালীদের যে ক্লাব ছিল, তিনি সেই ক্লাবের সভ্যদের বেশ প্রিয় হ'য়ে উঠলেন।

একবার এই ক্লাবের উদ্যোগে কবিবর নবীনচন্দ্রকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। শরৎচন্দ্র উদ্বোধন-সঙ্গীতটি গেয়ে ছিলেন। নবীন-চন্দ্র তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে 'রেঙ্গুন-রত্ন' উপাধি দিয়েছিলেন।

এর কিছুদিন পরে রেঙ্গুনের এক চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। মেয়েটির পিতা এক বুড়োর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে ঠিক করেন। মেয়েটি এই খবরে বড়ই বিহ্বল হয়, শরৎচন্দ্র এই বিয়েতে যুক্তিতর্ক দিয়ে বাধা দিতে যান। শেষে সকলে মিলে বিপন্ন পিতাকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করতে তাঁকে বাধ্য করে। শরৎচন্দ্রের একটি পুত্রসন্তানও হয়। রেঙ্গুনের সর্ব্বনাশা প্লেগের প্রকোপে প'ড়ে তাঁর স্ত্রী-পুত্র উভয়েই মারা পড়ে। এতে শরৎচন্দ্র মনে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন, আবার রেঙ্গুনে ফিরে যেতেন। একবার কলকাতায় এসে তিনি হিরণ্ময়ী দেবী নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যাকে বিয়ে করেন। ইনি তাঁর দ্বিতীয় পত্নী।

[library stamp] রাজবলহাট হুগলী

পাতা মুড়িবেন না
দাগ কাটিবেন না
মন্তব্য লিখিবেন না

পাঁচ

একবার শরৎচন্দ্র ছুটিতে কলকাতায় আসেন। তখন তাঁর পরিচিত ছেলের দল তাঁকে জানায়, একটা হারমোনিয়ম কেনার টাকা জুটছে না। যদি তিনি একটা গল্প লিখে দেন, তাহ'লে কুন্তলীন পুরস্কার পাবার জন্যে তারা সেটা পাঠিয়ে দেবে। শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি 'মন্দির' ব'লে একটা গল্প লিখে দেন। সেবার সেই গল্প কুন্তলীন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পায়।

১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় শরৎচন্দ্রের "বড় দিদি" গল্পটি প্রথম "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই লেখা পড়ে তিনি যে একজন খুব উঁচুদরের লেখক—একথা সবাই বুঝতে পারে।

তিনি "নারীর ইতিহাস" নামে একখানা বৃহৎ গ্রন্থ রচনা ক'রেছিলেন। তাঁর যে ছোটখাট একটি মূল্যবান্ লাইব্রেরীটি ছিল, তাতে সেই বইখানা ছিল। লাইব্রেরীতে তাঁর মহাশ্বেতা নামে প্রসিদ্ধ ছবিটাও ছিল। হঠাৎ সেই লাইব্রেরীতে আগুন ধ'রে যায়। আগুনে তাঁর বহু মূল্যবান গ্রন্থ, আর নানা জিনিষ পুড়ে যায়। এসব তিনি রক্ষা করতে পারেন নি, কিন্তু নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে একটা ছাগলকে রক্ষা করেছিলেন।

'যমুনা' মাসিক পত্রে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' নামক গল্পটা প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি 'পথনির্দ্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' লেখেন। তার পর 'চরিত্রহীন' উপন্যাস আরম্ভ করেন।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্যে' তাঁর অল্পবয়সের রচনা 'কাশীনাথ', 'বাল্যস্মৃতি' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। এ তাঁর ইচ্ছার

বিরুদ্ধেই হ'য়েছিল। কারণ, সে বয়সের কাঁচা লেখা প্রকাশ করার ইচ্ছা তাঁর একেবারেই ছিল না।

এর পর যমুনায় শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ', 'নারীর মূল্য,' 'আঁধারের আলো' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক 'বড়দিদি'। যমুনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র পাল তাঁর বইখানি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন। ১৩২০ সালে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হয়। সেই বৎসরই ভারতবর্ষে শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' প্রকাশিত হয়।

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য খুব খারাপ হ'য়ে পড়ে। চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে একশ' টাকার চাকরি ছেড়ে রেঙ্গুন থেকে চ'লে আস্‌তে হল। তিনি রেঙ্গুন থেকে এসে বাজেশিবপুরে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাক্‌তে আরম্ভ করেন। এই স্থানে থাকবার সময় তাঁর নানা রচনা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য কাগজে প্রকাশিত হয়।

রেঙ্গুন থেকে ফিরে আস্‌বার সময় তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল, তাঁকে অর্থকষ্টে পড়তে হবে। কিন্তু সাহিত্য-রচনায় তাঁর সুনাম দিন-দিন এমনি বেড়ে যেতে লাগল যে, শীঘ্রই তাঁর আয় পাঁচ শত টাকা ছাড়িয়ে গেল।

'শরৎচন্দ্র চিরকালই পরের দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়্‌তেন। ছেলেবয়স থেকে তিনি গরীব-দুঃখীদের নানা ভাবে উপকার ক'রে আসতেন। তাঁর আয় বেড়ে যাওয়ায় তিনি প্রাণ খুলে দুঃখীদের দান ক'রে যেতে থাকেন।

দিন-দিন তাঁর সুনাম সারা বাংলাদেশ ছাড়িয়ে বাংলার বাহিরে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়্‌তে থাকে। নানা জায়গা থেকে তাঁকে আহ্বান করা হয়। ১৩৩১ সালে মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি সাহিত্য-শাখার সভাপতি হন এবং ১৯৩১

খৃষ্টাব্দে কানপুর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে মূল সভাপতি হন। তার পরে তিনি কত জায়গায় যে সভাপতি হ'য়েছেন এবং কতভাবে যে সম্বর্দ্ধিত হ'য়েছেন, তা ব'লে শেষ করা যায় না। তাঁর সপ্ত-পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে টাউনহলে বাংলা-দেশের পক্ষ থেকে যে বিরাট বন্দনার আয়োজন হ'য়েছিল, তা' থেকে বোঝা যায়, তিনি দেশের কত প্রিয় ও কত আপনার ছিলেন!

ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিকপত্রে তাঁর অসংখ্য গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 'বিরাজ বৌ', 'পণ্ডিত মশাই', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'মেজদিদি', 'দর্পচূর্ণ', 'পল্লীসমাজ', 'শ্রীকান্ত', 'অরক্ষণীয়া', 'নিষ্কৃতি', 'মামলার ফল', 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা', 'নববিধান', 'হরিলক্ষ্মী', 'একাদশী বৈরাগী', 'বিলাসী', 'অভাগীর স্বর্গ', 'অনুরাধা', 'শেষপ্রশ্ন', প্রভৃতি নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বঙ্গবাণী পত্রিকায় 'মহেশ', 'সতী', বিচিত্রায় 'বিপ্রদাস' ও অসমাপ্ত রচনা 'অনাগত' বা 'আগামী কাল' প্রকাশিত হয়। 'বিপ্রদাস' প্রথম বেণু পত্রিকায় প্রকাশিত হ'তে থাকে, পরে তা বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। 'পরেশ' গল্পটি শরতের ফুল নামক বইয়ের একটি গল্প। শিশির পাব্‌লিশিং হাউস থেকে তাঁর 'বামুনের মেয়ে' প্রকাশিত হয়। মাসিক বসুমতীতে তাঁর 'জাগরণ' নামে একটা উপন্যাস সুরু হয়, তা শেষ হয়নি। ভারতবর্ষে 'শেষের পরিচয়' নামে যে রচনাটি প্রকাশিত হয়, তা' তিনি শেষ ক'রে যেতে পারেন নি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নারায়ণ পত্রিকায় তাঁর 'স্বামী' গল্পটি প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের সুনাম শুনে দেশবন্ধু তাঁর কাছে একটি রচনা চেয়ে আন্‌বার জন্যে লোক পাঠান। শরৎ-চন্দ্র গল্পটি পাঠান। চিত্তরঞ্জন গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হন এবং শরৎ-

চন্দ্রকে তাঁর গল্পরচনার পারিশ্রমিক-স্বরূপ একটা চেক পাঠান। তিনি সেই চেকের সঙ্গে একটু লিখে পাঠান—"যে অসামান্য শিল্পীর রচনা এবার 'নারায়ণ' বক্ষে ধারণ করবার সৌভাগ্য লাভ করলে, তার মূল্য নিরূপণের স্পর্দ্ধা আমার নেই। ব্র্যাঙ্ক চেক পাঠালুম, আপনি ইচ্ছামত এতে অঙ্ক বসিয়ে নেবেন। সেজন্য কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ বোধ করবেন না।" সেই চেকে দেশবন্ধু শুধু টাকার ঘরটা বাদ রেখেছিলেন। শরৎচন্দ্র ইচ্ছা করলে অনেক টাকা লিখে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি মাত্র একশ' টাকা লিখেছিলেন। এর পর থেকে দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

দেশবন্ধুর প্রেরণাতেই শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের কাজে যোগ দেন। তার পর থেকে সারা জীবন তিনি দেশের কাজ ক'রে গিয়েছেন। খদ্দর তাঁর বড় প্রিয় ছিল। তিনি যে শুধু খদ্দর পরতেন তাই নয়, তাঁর বিছানাপত্র থেকে দোরের পর্দ্দা পর্য্যন্ত খদ্দরের তৈরী ছিল। তিনি বহুকাল নিয়মিতভাবে চরকায় সূতো কেটেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের বহু বই নাটকাকারে রূপান্তরিত হ'য়েছে। সেই সব বই বহু থিয়েটারে এবং বায়োস্কোপে বিশেষ সুনামের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। তাঁর পল্লীসমাজের নাটকাকারে নাম হয় 'রমা', দেনাপাওনার নাম 'ষোড়শী', দত্তার নাম 'বিজয়া'। এ ছাড়া বহু বই আসল নামে অভিনীত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের এই সব রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'য়ে সকলের সমাদর লাভ ক'রেছে,—

অনুরাধা, সতী ও পরেশ, অরক্ষণীয়া, কাশীনাথ, গৃহদাহ, চন্দ্রনাথ, চরিত্রহীন, ছবি, তরুণের বিদ্রোহ, দত্তা, দেনাপাওনা, দেববাস, নববিধান, নারীর মূল্য, নিষ্কৃতি, পণ্ডিত মশাই,—

পরিণীতা, পল্লীসমাজ, বড় দিদি, বামুনের মেয়ে, বিন্দুর ছেলে, বিপ্রদাস, বিরাজ বৌ, বৈকুণ্ঠের উইল, মেজ দিদি, শেষ প্রশ্ন, শ্রীকান্ত (৪ খণ্ড), স্বামী, হরিলক্ষ্মী।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। তাঁর সকল লেখাই তিনি অতি যত্নের সঙ্গে পড়তেন এবং নিজেকে তাঁর সাহিত্য-শিষ্য বলতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকেও তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

ছয়

বাংলা ভাষা লেখায় শরৎচন্দ্রের ক্ষমতা ছিল অসীম; কিন্তু তিনি বক্তৃতা করতে মোটেই পারতেন না। সভা-সমিতি তিনি যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতেন। একান্ত বাধ্য না হ'লে তিনি বড় একটা সভা-সমিতিতে যেতেন না। কিন্তু সভায় বা সাধারণ আলোচনায় তিনি যে সব বক্তৃতা করেছেন, তাতে বাঙ্গালার লোক অনেক কিছুই পেয়েছে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ রংপুরে যে যুব-সম্মেলন হয়, তিনি তার সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি তাতে বলেন,—

"বৈদেশিক শাসন আমাদিগকে অস্ত্রহীন ও দুর্ব্বল করিয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ ভেদ-বৈষম্যই আমাদিগকে অধিকতর দুর্ব্বল করিয়াছে এবং প্রকৃত উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। এই হৃদয়হীন সমাজ, প্রেমহীন ধর্ম্ম, সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিরোধ, আর্থিক বৈষম্য এবং নারীর উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার—এই সবই আমাদের দুর্দ্দশার কারণ।"

কলিকাতার বেতার-আফিসে প্রতি বৎসর ৩১শে ভাদ্র শরৎ-চন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে 'শরৎ শর্ব্বরী' নামে এক অনুষ্ঠান

হ'ত। এই অনুষ্ঠানে বাংলার বহু খ্যাতনামা লোক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন।

সঙ্গীত তাঁর চিরকালই ভাল লাগত; তাই তিনি পল্লীতে ব'সে বেতার-সঙ্গীত শুনে আনন্দ পেতেন। একবার এই বেতার-সঙ্গীত-সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন,—

"শহর হইতে দূরে গ্রামের মধ্যে আমার বাস। অতীতের নানাপ্রকার আমোদ ও আনন্দের প্রাত্যহিক আয়োজন গ্রামে আর নাই, পল্লী এখন নির্জ্জীব নিরানন্দ। কর্ম্মক্লান্ত দিনের কত সন্ধ্যায় এই নিঃসঙ্গ পল্লী-ভবনে বেতারের জন্য উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াছি। শ্রাবণের ঘন মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসে, কর্দ্দমাক্ত জনহীন গ্রাম্য পথ নিতান্ত দুর্গম, নিবিড় অন্ধকার ভারের মত বুকের পরে চাপিয়া বসে, তখন বেতার-বাহিত গানের পালায় মনে হয় যেন দূরে থাকিয়াও আসরের ভাগ পাইতেছি।

আবার কোনদিন ক্ষান্তবর্ষণ আকাশে লঘু মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো দেখা দেয়, বর্ষার সুবিস্তীর্ণ নদী-জলে মলিন জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়ে, আমি তখন প্রাঙ্গণের একান্তে নদী-তটে আরাম-কেদারায় চোখ বুজিয়া বসি, তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশিয়া বেতার বাঁশীর সুর যেন মায়াজাল রচনা করে। দু' একজন করিয়া প্রতিবেশী জুটিতে থাকে, ঘাটে বাঁধা নৌকায় দূরের যাত্রী কৌতূহলী দাঁড়ী-মাঝির দল নিঃশব্দে আসিয়া ঘিরিয়া বসে, আবার শেষ হইলে পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া যে যাহার আলয়ে চলিয়া যায়। এই আনন্দের অংশ আমি পাই।"

শরৎচন্দ্র চিরকাল শহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামকেই বেশী ভালবাসতেন। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির থেকে তাঁর গ্রন্থাবলী

যখন প্রকাশিত হয়, সেই সময় তিনি শিবপুরের বাস তুলে দিয়ে পানিত্রাস সামতাবেড়ে রূপনারায়ণের তীরে বাড়ী তৈরী করেন। এই খানেই তাঁর পরের জীবনের বেশীর ভাগ কাটে। তিনি শেষ জীবনে বালিগঞ্জে বাড়ী করলেও প্রায়ই সামতাবেড়ে গিয়ে থাক্‌তেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহমূর্ত্তি দান ক'রে যান। তিনি সামতাবেড়ের বাড়ীতে যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়মিত ভাবে পূজা করতেন।

শরৎচন্দ্র একান্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তাঁর সামতা-বেড়ের বাড়ীতে বহু লোকের সমাগম হ'ত। তিনি তাঁদের তৃপ্তি দেবার জন্য পরিচর্য্যার কোন রকম ত্রুটি করতেন না। সকল লোককেই তিনি অতি যত্নের সহিত খাওয়াতেন।

শরৎচন্দ্র ঝি-চাকরদের ঠিক বাড়ীর আপনার লোকদের মত আদর-যত্ন করতেন। তাদের তিনি পরমাত্মীয় ছিলেন। তাঁর আন্তরিক ভালবাসা তারা সারা মন দিয়েই বুঝ্‌ত।

গ্রামবাসীদের মঙ্গলচিন্তায় তিনি বিভোর থাকতেন। তিনি তাঁর পল্লীতে নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছিলেন, রাস্তাঘাট সংস্কার করেছিলেন, মেয়েদের একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, জলাশয় খনন করিয়েছিলেন। তাঁর হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক চিকিৎসায় যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। তিনি বিনা পয়সায় গরীবদুঃখীদের চিকিৎসা করতেন। অজস্র দান ক'রে তিনি অভাবগ্রস্তের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করতেন।

তিনি সাহিত্য-পরিষদের সাহিত্য শাখার সভাপতি হ'য়েছিলেন। হাওড়ার পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির তিনি একজন কর্ণধার ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভার তিনি বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। বহুদিন তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস

কমিটীর সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়া বহুভাবে বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

সাহিত্য-সেবকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান-স্বরূপ শরৎচন্দ্র কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক পান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি-লিট' উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় বাংলার প্রশ্নকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ফাঁকি ও মিথ্যাকে ঘৃণা করতেন। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। শ্রদ্ধা করতেন বলেই তার দোষত্রুটি তিনি সহ্য করতে পারতেন না এবং তাঁর লেখা নানা উপন্যাসের ভিতর দিয়ে তারই তীব্র প্রতিপদ ফুটে বেরিয়েছে।

সাত

মানুষের উপর শরৎচন্দ্রের ভালবাসা যেমন গভীর ছিল, সাধারণ পশুপক্ষীর উপরও তেমনই তাঁর গভীর মমতা ছিল। সকলে তাঁর মনের এই অত্যাশ্চর্য্য মমতার পরিচয় পেয়ে অবাক্ হ'য়ে যেত।

শরৎচন্দ্র একবার তাঁর একটা প্রিয় পাখী মারা যাওয়ায় তিন দিন খান নি, আফিস কামাই ক'রে বাড়ী ব'সে ছিলেন।

একবার তিনি একটা ছাগলকে কসাইদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আনেন। তিনি তার নাম দিয়েছিলেন 'স্বামিজী'।

তাঁর বাড়ীতে তিনটি গরু ছিল। দুধ বন্ধ হ'য়ে গেলে সকলে তাঁকে গরু তিনটিকে বিদায় ক'রতে বলে। তিনি তাদের কথা শোনেন নি। তিনি আগের মতই তাদের যত্ন

করতেন, বলতেন, "আমি ওদের কাছে অকৃতজ্ঞ হ'তে পারবো না।"

তাঁর ভেলু নামে একটা কুকুর ছিল। এই কুকুরটাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। এই উপলক্ষে 'ভারতবর্ষ' মাসিক-পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গত জলধর সেন লিখেছেন,—

"শরৎচন্দ্র কুকুরটির এই নামকরণ কেন করেছিলেন, জানিনে। কুকুরটি দেখতে ছিল কদাকার আর তার আচরণ ছিল অতি অভদ্র। যে কেউ শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাসায় গিয়েছেন, তিনি জানেন ভেলুর অভ্যর্থনা কি রকম। শরৎ-দর্শন-প্রার্থিবৃন্দ ভেলুর সম্ভাষণে আত্মরক্ষার্থ দশ হাত পেছিয়ে পড়তেন। শরৎচন্দ্র ঘরের ভিতর থেকে যেই বলতেন, 'এই ভেলু', আর অমনি ভেলু মেষ-শাবকের মত ছুটে গিয়ে শরৎ-চন্দ্রের কোলের কাছে গিয়ে বসতো। শরৎচন্দ্র তাঁর এই ভেলুকে যে কি ভালবাসিতেন, তা বলে শেষ করা যায় না। শুধু ভেলু নয়, সমস্ত জীবজন্তুর উপরই শরৎচন্দ্রের যে কি টান ছিল, তা অনির্ব্বচনীয়।

সেই ভেলু যখন অসুস্থ হয়ে পড়লো, বাড়ীতে যত রকম চিকিৎসা করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র তা করালেন। দু'হাতে অর্থব্যয় করতে লাগলেন। শেষে অনন্যোপায় হয়ে 'ভেলুকে' বেলগাছিয়ার পশু-চিকিৎসালয়ে নিয়ে গেলেন—পাঠিয়ে দিলেন না। 'ভেলু' যে কয়দিন সেখানে বেঁচেছিল, শরৎচন্দ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠে সেই পশু-হাসপাতালে গিয়ে ভেলুর পিঞ্জর-প্রান্তে বসতেন। সারাদিন স্নানাহার ত্যাগ করে ভেলুর দিকে সকাতরে চেয়ে থাকতেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি ভেলুকে বাঁচাতে পারলেন না। তার মৃতদেহ শিবপুরের বাড়ীতে এনে সমাধিস্থ করলেন। সংবাদ পেয়ে আমি সেই দিনই শিবপুরে

গেলাম। আমাকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে শরৎচন্দ্র কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'দাদা, আমার ভেলু আর নেই।' তাঁর মুখ দিয়ে কথা আর বের হল না।"

গরীব-দুঃখীর দুঃখে শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি ছিল খুব বেশী। তিনি সকল রকমে তাদের দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করতেন। জলধর সেন লিখেছেন,—

"একদিন প্রাতঃকালে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেম। দেখি ঘরের মধ্যে একরাশ মিলের ছোট-বড় ধুতি-শাড়ী ছড়ানো রয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য সেগুলি গুছিয়ে বাঁধবার আয়োজন করছে। শরৎচন্দ্র সমুখের টেবিলের অনেকগুলি আনি-দুয়ানি-সিকি গুণে-গুণে রাখছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'দাদা, আমি এই দশটার গাড়ীতেই দিদির বাড়ী যাবো। তা'বলে আপনি চলে যাবেন না। যাবেন সেই রাত দশটায়।'

আমি বললাম, 'দিদির বুঝি কোন ব্রত-প্রতিষ্ঠা আছে---তাই এত কাপড় নিয়ে যাচ্ছো? আর কাঙালী বিদায়ের জন্য বোধ করি ঐ আনি-দুয়ানি?'

শরৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'না দাদা, দিদির ব্রত-প্রতিষ্ঠা নয়। এই বলেই তিনি চুপ করলেন। আসল কথাটা যেন গোপন করাই তাঁর ইচ্ছা। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করায় শরৎ অতি মলিন মুখে বললেন, 'দাদা দিদির গাঁয়ের আর তার চার পাশের গাঁয়ের গরীব-দুঃখী মানুষদের যে কী দুর্দ্দশা!—তাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, চালে খড় নেই---সে যে কি—'

শরৎ আর কথা বলতে পারলেন না। তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।"

আট

শেষ বয়সে শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে পড়ে। একবার জ্বরে তিনি শয্যাগত হ'য়ে পড়েন। সেই জ্বর সারলে চিকিৎসকদের পরামর্শে দেওঘরে হাওয়া বদলাইতে যান। মাসখানেক পরে তিনি ফিরে আসেন। ফিরে এসে আবার তাঁর শরীর অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। নানারকম চিকিৎসা ক'রে একটু সুস্থ হ'লে তিনি সামতাবেড়ে যান। সেখান থেকে আবার তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

কলকাতায় বড় বড় ডাক্তার পরীক্ষার দ্বারা স্থির করেন, তাঁর পাকস্থলীতে ক্যানসার হ'য়েছে, অস্ত্রোপচার করা দরকার। শরৎচন্দ্র মনের সাহস এতটুকুও হারান নি। তিনি চিকিৎসকদের নির্ভয়ে অস্ত্রোপচার করতে বলেন।

অস্ত্রোপচার করা হ'ল।। কিন্তু তাঁকে বাঁচান গেল না। ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ রবিবার বেলা দশটার সময় তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবাসী শোকার্ত্ত হ'য়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

যাঁহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তাঁর ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যাঁরে হরি'।
দেশের হৃদয় তাঁরে রাখিয়াছে বরি'।

—শেষ—

রাজবলহাট

চারি আনা সংস্করণ জীবন-চরিতাবলী

১। বিদ্যাসাগর
২। চৈতন্য
৩। শ্রীরামকৃষ্ণ
৪। বিবেকানন্দ
৫। চিত্তরঞ্জন
৬। আশুতোষ
৭। রামমোহন
৮। বঙ্কিমচন্দ্র
৯। হাজি মহম্মদ মহসীন
১০। ভূদেব মুখোপাধ্যায়
১১। হেন্‌রী ফোর্ড
১২। রাবেয়া
১৩। মহাত্মা গান্ধী
১৪। স্যার জগদীশচন্দ্র
১৫। কামাল আতাতুর্ক
১৬। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন
১৭। রবীন্দ্রনাথ
১৮। শিবাজী
১৯। সার রাসবিহারী
২০। নেপোলিয়ন
২১। স্যার সৈয়দ আহম্মদ
২২। দ্বিজেন্দ্রলাল
২৩। সার গুরুদাস
২৪। মাইকেল
২৫। গোখেল
২৬। হেমচন্দ্র
২৭। নানক
২৮। সার রাজেন্দ্রনাথ
২৯। চাঁদ সুলতানা
৩০। শরৎচন্দ্র
৩১। স্যার জেম্‌সেদজি টাটা
৩২। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র
৩৩। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ
৩৪। কেশব সেন

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

পাতা মুড়িবেন না
দাগ কাটিবেন না
মন্তব্য লিখিবেন না

চার আনা সংস্করণ জীবন চরিতাবলী

১।	বিদ্যাসাগর	১৮।	শিবাজী
২।	চৈতন্য	১৯।	সার রাসবিহারী
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণ	২০।	নেপোলিয়ন
৪।	বিবেকানন্দ	২১।	সার সৈয়দ আহম্মদ
৫।	চিত্তরঞ্জন	২২।	দ্বিজেন্দ্রলাল
৬।	আশুতোষ	২৩।	সার গুরুদাস
৭।	রামমোহন	২৪।	মাইকেল
৮।	বঙ্কিমচন্দ্র	২৫।	গোখেল
৯।	হাজি মহম্মদ মহসীন	২৬।	হেমচন্দ্র
১০।	ভূদেব মুখোপাধ্যায়	২৭।	নানক
১১।	হেনরী ফোর্ড	২৮।	সার রাজেন্দ্রনাথ
১২।	রাবেয়া	২৯।	চাঁদসুলতানা
১৩।	মহাত্মা গান্ধী	৩০।	শরৎচন্দ্র
১৪।	স্যার জগদীশচন্দ্র	৩১।	স্যার জেমসেদজি টাটা
১৫।	কামাল আতাতুর্ক	৩২।	আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র
১৬।	দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন	৩৩।	রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ
১৭।	রবীন্দ্রনাথ	৩৪।	কেশব সেন

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা